

কিশোর রহস্য উপন্যাস

মিশন ডাঙ্গলবাড়ি

রবিউল ইসলাম





এক.

স্কুলের নাম ধুলিয়াপুর। পড়ালেখায় এই স্কুলের বেশ সুনাম। পুরো নাম ধুলিয়াপুর বালক উচ্চ বিদ্যালয়। দুইটি দ্বিতল ভবন। সামনে বিশাল খেলার মাঠ। মাঠের ওপাশে আবার ঘন বন। স্কুলটি ওই বনের কোলঘেঁষে অবস্থিত। রাকিব, শাইক ও সাকিব। ধুলিয়াপুর স্কুলের সেরা তিন ছাত্র। এক ক্লাসেই পড়ে ওরা। এবার অষ্টম শ্রেণিতে উঠেছে। তিনজনের আবার ভারি মিল। বলা যায়—গলায় গলায় মিল। ক্লাসের রোলও এক, দুই, তিন। স্কুলে সবাই ডাকে ‘তিন দুরন্ত’। বলবেই-বা না কেন? শুধু কি পড়ালেখা! আদবকায়দা সবকিছুতে ওরা এগিয়ে। রাস্তায় স্যারদের সঙ্গে দেখা হলে সাইকেল থেকে নামা, খেলার সময় আজান হলে খেলা বন্ধ রেখে নামাজে যাওয়া, বড়োদের সঙ্গে দেখা হলে সালাম দেওয়া, সব গুণই আছে এই ত্রিরত্নের।

সেদিন বিকেলে বাজারে গেছে তিন দুরন্ত। বাজারে আবার চেয়ারম্যানের একটি দোকান আছে। ঘটনা ঘটল ওই দোকানে। ওরা দেখল, স্কুলের কিছু ছেলে গন্ডগোল করছে; তাও আবার চেয়ারম্যানের ছেলের সঙ্গে। ওরা তিনজন এগিয়ে গিয়ে সবাইকে থামানোর চেষ্টা করল। এতে চেয়ারম্যানের ছেলের মেজাজ খুব খারাপ হলো। ক্ষেপে গিয়ে সে রাকিবের পিঠ বরাবর ঘুসি মেরে দিলো।

ধাক্কা সামলাতে না পেরে রাকিব রাস্তার ওপর পড়ে গেল। সঙ্গে

সঙ্গে শাইক ও সাব্বির চেয়ারম্যানের ছেলেকে জাপটে ধরল; কিন্তু ওকে মারল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে অনেক ভিড় জমে যাওয়ায় পরিস্থিতি খারাপ দেখে চেয়ারম্যানের ছেলে ওখানে আর দাঁড়াল না, পালিয়ে গেল। কিন্তু যাওয়ার আগে বলে গেল, ‘তোদেরকে দেখে নেব!’

পরে রাকিবকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। ডাক্তার সামান্য ব্যথার ওষুধ দিয়েছেন। বলেছেন, এতেই ঠিক হয়ে যাবে।

তিন বন্ধুই নিয়মিত নামাজ পড়ে। মাগরিবের আজান হয়ে যাওয়ায় পাশের মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করল। নামাজ শেষে হাঁটতে হাঁটতে স্কুলের মাঠে পৌঁছাল। মাঠের এক কোনায় ভালো একটা জায়গা দেখে বসে গল্প শুরু করল। গল্পে গল্পে অনেকটা সময় পেরিয়ে গেল।

রাত গভীর হচ্ছে। দূর থেকে এশার আজান ভেসে আসছে। ওরা নামাজ পড়েই বাড়িতে ফেরার পরিকল্পনা করল। তাই তিন বন্ধু উঠে দাঁড়াল। মসজিদে যাবে। সেই সময় শাইকের দৃষ্টি গেল বনের দিকে। ওর মনে হলো, বনের মধ্যে কেউ ঢুকছে। সঙ্গে সঙ্গে রাকিব ও সাব্বিরকে ডেকে বলল, ‘আমার মনে হয়, বনের মধ্যে কারা ঢুকছে।’

শাইকের কথা শুনে ওরাও সেদিকে তাকাল; কিন্তু কাউকে দেখতে পেল না। রাকিব বলল, ‘ওসব তোর মনের ভুল। এই রাতে বনের মধ্যে কারা যাবে! খেয়ে কাজ নেই কারও।’

ওরা দুজন শাইকের কথাকে পাত্তাই দিলো না। সাব্বির বলল, ‘জামাতের সময় হয়ে যাচ্ছে। আগে চল নামাজটা শেষ করি।’

তারপর তিন বন্ধু বাজারের মসজিদে নামাজ পড়ে যার যার বাড়িতে চলে গেল।



দুই.

পড়ার টেবিলে বসে আছে শাইক, কিন্তু কিছুতেই পড়ায় মন বসছে না। ও ঠিকই দেখেছে, বনের মধ্যে কেউ ঢুকেছে। কিন্তু সাক্ষির আর রাকিব ওর কথাকে পাত্তাই দিলো না! একটু অভিমান হলো ওদের ওপর। তখন আম্মু এসে বললেন, ‘কী ব্যাপার, শাইক! পড়া বাদ দিয়ে কী চিন্তা করছ?’

‘না, তেমন কিছু না, আম্মু,’ বলে শাইক হোমওয়ার্ক করতে শুরু করল। মনে মনে বলল, বনের ব্যাপারটা পরে দেখা যাবে।

পড়া শেষ করে রাতের খাবার খেল শাইক। তারপর কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সকাল হয়েছে। চারদিকে পাখি ডাকছে। জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সূর্যের নরম রোদ এসে পড়ছে শাইকের কপালে। ও দ্রুত উঠল। জলদি স্কুলে যেতে হবে। ফজরের নামাজ পড়ে বিছানায় যেতেই কখন ঘুমিয়ে পড়েছে, টের পায়নি।

দেরি না করে দাঁত ব্রাশ করে সকালের নাশতা খেয়ে স্কুলব্যাগটা কাঁধে নিয়ে ঘর থেকে বের হলো। তারপর সাইকেলটা নিয়ে স্কুলের দিকে রওনা দিলো।

শাইক স্কুলে গিয়ে দেখল, সেখানে অনেক ভিড়। স্কুলের গেটে পুলিশের গাড়ি। সাক্ষির ও রাকিব দাঁড়িয়ে আছে। পুলিশ

হেডস্যারের সঙ্গে কথা বলছে। হেডস্যার মাথা চুলকাচ্ছেন আর কথার উত্তর দিচ্ছেন। দূর থেকেও বোঝা যাচ্ছে, তিনি বেশ চিন্তিত। শাইক সাইকেলটা বটগাছের পাশে রাখল। তারপর সেও রাকিব ও সাক্ষিরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। জানতে চাইল, ‘এখানে কী হয়েছে রে?’

রাকিব বলল, ‘গত রাতে স্কুলের মাঠের কোনায় খুন হয়েছে। পুলিশ এসে লাশ উদ্ধার করেছে।’

‘আচ্ছা, কে খুন হয়েছে?’ শাইক আবার জানতে চাইল।

এবার সাক্ষির বলল, ‘এখনও তার নাম-পরিচয় জানা যায়নি। মনে হয়, এই গ্রামের কেউ না। পুলিশ ধারণা করছে, শহরের কেউ হবে।’

একটু পর পুলিশ লাশ নিয়ে চলে গেল। হেডস্যার স্কুলের সবাইকে সাবধানে থাকতে বললেন। স্কুল চলল, কিন্তু একটি ক্লাস পরেই ছুটি হয়ে গেল। সবার মধ্যে একধরনের আতঙ্ক কাজ করছে।

স্কুল থেকে একসঙ্গে ফিরছে রাকিব, সাক্ষির ও শাইক। ওরা সাইকেল রেখে এক জায়গায় বসল। শাইক বলল, ‘আমি কিন্তু কাল ওদিকে কাউকে যেতে দেখেছিলাম। তোরা তো বিশ্বাসই করলি না।’

‘তোর কী মনে হয়, তুই যদি সত্যি কিছু দেখে, থাকিস, তার সঙ্গে এই ঘটনার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে।’ বলল রাকিব।

শাইক বেশ জোরেই বলল, ‘অবশ্যই থাকতে পারে।’

‘আচ্ছা তোরা তর্ক বাদ দে তো। আমরা বরং আজ রাতে ওদিকে

খেয়াল রাখব। দেখি কিছু চোখে পড়ে কি না।’ সাক্ষির বলল।

‘হ্যাঁ, সেটাই ভালো হবে।’ শাইক বলে উঠল।

রাকিবও ওদের সাথে একমত হয়ে বলল, ‘ঠিক আছে, আজ বিকেলে তাহলে কোনো খেলা হবে না। আসরের নামাজ শেষ করেই আমরা এদিকে চলে আসব।’

তারপর তিন বন্ধু সাইকেল নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দিলো।

রাকিবকে আজ দ্রুত বাড়িতে ফিরতে দেখে ওর আব্বু জানতে চাইলেন, ‘কী ব্যাপার, আজ তুমি এত আগে বাড়িতে এলে যে! স্কুলে ফাঁকি দাওনি তো?’

‘না আব্বু, আমাদের স্কুলের মাঠে একটা খুন হয়েছে। তাই স্কুল আগেই ছুটি হয়ে গেছে।’

এ কথা শুনে রাকিবের আব্বু যেন চমকে উঠলেন। বললেন, ‘বলো কি! এ গ্রামে খুনটুন তো হয় না! তা কাকে খুন করা হয়েছে।’

‘এখনও পরিচয় জানা যায়নি।’ রাকিব উত্তর দিলো।

‘তোমরা সাবধানে থাকবে, কোনো রকম ঝামেলায় জড়াবে না,’ বলেই রাকিবের আব্বু বাইরে চলে গেলেন।

সাক্ষিরের বাসাতেও একই ঘটনা। ও অবশ্য মামার বাড়িতে থাকে। তার বাবা-মা দুজনই অস্ট্রেলিয়ায় থাকেন। মামা বললেন, ‘তুমি আজকে আগে ফিরলে যে!’

‘কেন মামা, তুমি শোনোনি, স্কুলের মাঠে একজন খুন হয়েছে?’ সাক্ষির বলল।

এ কথায় সাক্ষিরের মামাও রাকিবের আব্বুর মতো যেন আকাশ থেকে পড়লেন, ‘কী বলছ তুমি? এই গ্রামে খুন!’

অবশ্য শাইকের আন্সু ওকে কোনো প্রশ্ন করলেন না। ওরা দুপুরের খাবার খেয়ে একটু বিশ্রাম নিল। তারপর আসরের একটু আগে বের হলো। আজ আর কেউ সাইকেল নিয়ে বের হলো না। বাজারের মসজিদে নামাজ পড়ে একসাথে স্কুলের মাঠের দিকে গেল। সেখানে একটু গা ঢাকা দিয়ে ওরা পায়চারি করতে লাগল, যদি সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ে!

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। তখনও সন্দেহজনক কিছু ওদের চোখে পড়েনি। মাগরিবের আজান হলে ওরা মসজিদে গেল। নামাজ পড়ে এসে আবার মাঠের এক কোনায় বসল। এমনভাবে বসল, যেন কেউ ওদেরকে দেখতে না পায়। একটু পরে ওরা দেখতে পেল, ওদেরই স্কুলের দশম শ্রেণির এক ছাত্র বনের ওদিক দিয়ে বের হলো। তারপর রাস্তা ধরে বাজারের দিকে গেল।

ওরা তিনজন তার দিকে আর খেয়াল না করে বনের দিকে গেল।

খুব সাবধানে ওরা বনের মধ্যে ঢুকল। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোনো কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তাই খুব বেশি ভেতরে ঢুকল না তিন দুরন্ত।

হঠাৎ পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। তখনই ওরা তিনজন থেমে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আওয়াজ শুনে বোঝা যাচ্ছে, কয়েকজন আসছে। ধীরে ধীরে সেই আওয়াজ আরও কাছে চলে এলো। রাকিব, সাক্ষির ও শাইক নিশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। দেখল, দুজন ওদের পাশ কাটিয়ে স্কুলের

মাঠের দিকে এগিয়ে গেল। তারা কীসব কথা যেন বলছিল। কেবল একটি কথা তিনজনই স্পষ্ট শুনতে পেল, ‘আমার আব্বু এবারের চালান ফুল করে দেবে।’

কণ্ঠটা ওদের খুব পরিচিত। সম্প্রতি এই কণ্ঠ শুনেছে ওরা। তিন দূরন্ত ধীরে ধীরে বনের বাইরে বেরিয়ে এলো। তারপর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করল, কার কণ্ঠ হতে পারে! আর কীসের চালানোর কথাই-বা বলল তারা। তখন সাক্ষির চিৎকার করে বলল, ‘আমি চিনতে পেরেছি! এই কণ্ঠ আমি চিনতে পেরেছি!’

রাকিব বলল, ‘তাহলে বলছিস না কেন?’

‘হ্যাঁ, দ্রুত বল, শাইক কণ্ঠ শোনার আগ্রহে বাড়িয়ে বলল।

সাক্ষির বলল, ‘এটা চেয়ারম্যানের ছেলের কণ্ঠ। ওই দিন বাজারে ও আমাদেরকে বলেছিল, তোদেরকে দেখে নেব। এটা তো সেই কণ্ঠ।’

সঙ্গে সঙ্গে শাইক বলল, ‘হ্যাঁ, আমারও মনে পড়েছে, এটা চেয়ারম্যানের ছেলেই হবে।’

রাকিব বলল, ‘কিন্তু চেয়ারম্যানের ছেলে এখানে কী করতে এসেছে? আর কীসের চালানোর কথা বলছে?’

সাক্ষির বলল, ‘এটাই তো রহস্য। হয়তো খুনের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে।’

শাইক বলল, ‘তুই তো দেখি গোয়েন্দাদের মতো কথা বলছিস।’

‘যদি আমার ধারণা সত্যি হয়, এই রহস্য আমরা সমাধান করব, ইনশাআল্লাহ।’ সাক্ষির বলল।



তিন.

স্কুলে এসেছে তিন বন্ধু। কিন্তু আজও স্কুলে কোনো আনন্দ নেই। কাল সন্ধ্যার পর থেকে দশম শ্রেণির এক ছাত্রকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওই ছাত্রের নাম ইকবাল। ইকবালের বাবা-মা স্কুলে এসে খুব কান্না করছেন। থানায় জিডি করা হয়েছে; কিন্তু পুলিশ এখনও কোনো খোঁজ দিতে পারেনি।

রাকিব, সাক্ষির ও শাইক হেডস্যারের রুমের দিকে গেল। ওরা রুমের বাইরে দাঁড়াল। হেডস্যার বললেন, ‘তোমরা ভেতরে এসো।’

স্যারের অনুমতি পেয়ে তিন দুরন্ত ভেতরে ঢুকল। শাইক প্রথমেই বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম, স্যার।’

‘ওয়ালাইকুম আসসালাম।’ হেডস্যার সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ‘তোমরা কিছু বলবে?’

সাক্ষির বলল, ‘স্যার, ইকবাল ভাইকে আমরা কাল সন্ধ্যার পর স্কুলের পাশের রাস্তায় দেখেছিলাম।’

‘কী বলছ, সে এখানে কী করছিল? আর গেলই-বা কোথায়?’ হেডস্যার খানিকটা উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন।

রাকিব বলল, ‘স্যার, ইকবাল ভাইকে আমরা ওই বনের ভেতর থেকে বের হয়ে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাজারের দিকে যেতে দেখেছিলাম।’



‘কীভাবে সাহায্য
করবে শুনি?’
জানতে চাইলেন
হেডস্যার।
সাব্বির বলল,
‘স্যার, আমরা
হয়তো আতিক
ও ইকবাল
ভাইকে খুঁজে
বের করতে
পারব।’
হেডস্যার
বললেন,
‘সত্যিই তোমরা
পারবে?’

তখনই কাঁদতে কাঁদতে আতিকের বাবা
টুকলেন হেডস্যারের রুমে। আতিকও
এই স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ে।
আতিকের বাবা বললেন, ‘স্যার, আমার
ছেলেটাকে রাত থেকে খুঁজে পাওয়া
যাচ্ছে না। সব জায়গায় খোঁজ নিয়েছি,
কিন্তু কোথাও নেই। পুলিশও কোনো
খোঁজ দিতে পারছে না।’

স্যার উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বুঝতে
পারছেন না চারিদিকে এসব কী হচ্ছে!
আফসোস করে বললেন, ‘হঠাৎ কী শুরু
হলো আমার স্কুলে!’ তারপর আতিকের
বাবাকে বললেন, ‘আপনি বাড়িতে যান,
আমি দেখছি কী করা যায়।’

আতিকের বাবা চলে গেলে রাকিব
বলল, ‘আমরা মনে হয় এ ব্যাপারে

আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারব, স্যার।’

‘কীভাবে সাহায্য করবে শুনি?’ জানতে চাইলেন হেডস্যার।

সাব্বির বলল, ‘স্যার, আমরা হয়তো আতিক ও ইকবাল
ভাইকে খুঁজে বের করতে পারব।’

হেডস্যার বললেন, ‘সত্যিই তোমরা পারবে?’

তিন বন্ধু তখন একসঙ্গে বলল, ‘ইনশাআল্লাহ পারব, স্যার।’